MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT OF BENGAIL (UG)

ASSIGNMENT

TOPICS :- ① বাংলা সাহিত্যের কবিতার জগতে কবি জীবনানন্দ দাশ এর অবদান?

② বাংলা কাব্য কবিতার জগতে হেমচন্দ্রের অবদান লেখো?

③ বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান লেখো?

FULL Name :- SUCHITRA SAMANTA

ROLL NO :- 150

class :- B.A (HONS.)

Sem :- III

Academic year :- 2023-24

Date of submission :- 30/11/23

Bamni 14/12/23

Professor Signature

Suchitra Samanta

Students Signature

3. কবি ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ১৮৩১ সাল থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে, তিনি ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। অজস্র কবিতা রচনা করেছেন সংবাদ পত্রের পাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁর কবিতা গুলিকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। তবে অশ্লীলতার কারনে তিনি সব কবিতা সংগ্রহ করেন নি। তাঁর অন্যান্য রচনা গুলি হলো—

i) কালীকীর্তন - রামপ্রসাদ সেন লিখিত;

ii) কবি বর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত - ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত;

iii) প্রবোধ প্রভাকর - নিজস্ব কবিতার সংকলন;

iv) হিত প্রভাকর - হিত পদেশের গল্প গদ্যে পদ্যে রচিত;

v) মহাকবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরোচিত কবিতাগুলির সার সংগ্রহ - কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক - সংবাদ প্রভাকর থেকে সংগৃহীত কবিতার খন্ড খন্ড সংকলন,

vi) বোধেন্দু বিকাশ - নাটক,

vii) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা

viii) পত্রিকা সম্পাদনা - সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক - ১৮৩১) দৈনিক (১৮৩৯)

ix) সংবাদ রত্নাকর (১৮৩২)

x) পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪৬)   xi) সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)

সামাজিক ও ব্যঙ্গকবিতার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি সর্বাধিক। তাঁর ব্যঙ্গ রসপ্রবণতা ও লঘু চপল ভঙ্গি কবিতাগুলিকে উৎকর্ষতা দান করেছে। সে আমলে ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালি সমাজ ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই কবি উপজীব্য ~~বকল~~ ~~মনন~~ করেছেন। সেখানেই সামাজিক অনাচার, চারিত্রি দৈন্য ও আদর্শহীনতা দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রাচীন নবীনের কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁর সমাজ সংক্রান্ত কবিতায় বিষয়বস্তু ছিলো বৈচিত্র্যপূর্ণ, যেমন - বিধবা-বিবাহ আন্দোলন বিরোধিতা কৌলিন্য প্রথার অপকারিতা, বাঙালির সাহেবিয়ানা - অনুকরণ প্রিয়তা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সমাজের বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন স্ত্রীধর্ম লোপের আশঙ্কা, গো-হত্যা, জমিদারদের অনাচার - ব্যভিচারের বর্ণনা খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রিয়াকলাপে অশ্রদ্ধা, নীলকর সাহেবের অত্যাচার - অবিচার ইত্যাদি।

ইংরেজদের আচার - আচরণকে স্বদেশের জন্য অকল্যাণকর মনে করে ইংরেজিয়ানের প্রতি ব্যঙ্গ করে 'ইংরেজি নববর্ষ' কবিতায় কবি লিখেছেন ——

"ধন্য রে বোতলবাসী ধন্য লাল জল,
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার কল।"

- তাঁর 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতায় ও অন্ধ মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিলো না বলে তিনি লিখেছেন ——

"লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিলো,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া,
ঠাট-ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া।"

'নীলকর' কবিতায় নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কবি মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন, তাতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর পরিহাস মধুর মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে

—— "তুমি মা কল্পতরু
আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,

কেবল খাবো খোল বিচালী ঘাস
যেনো রাঙা আমলা, তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না;
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হবো
ঘুষি খেলে বাঁচবো না,"

তুচ্ছ বিষয়েও তাঁর কৌতুক রসের প্রকাশের সন্ধান করে দিয়েছে, যেমন 'পাঁঠা' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

" রস ভরা রসময় রসের ছাগল,
তোমার কারনে আমি হয়েছি পাগল," —

বাঙালীর অন্তঃপুরের বিভিন্ন ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যে সব কবিতা রচনা করেছেন তাও বেশ সুমধুর —

" আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর,
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার,,
কাড়ি কাড়ি নেমন্তন্ন কুটুম্বের মেলা,
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা," —

কবিতায় চারপাশে যে সব মানুষ দেখেছেন তার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন কি তাঁর মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ অম্লান ছিলো নিজের ব্যবহার - আচরনে - কর্মেও সেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখতে পান নি। তাই লিখেছিলেন —

" স্বরূপ মানুষ কই, এমন মানুষ কই.
আমি তো মানুষ নিজে নই,"

ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবিষয়ক কবিতার আলোচনায় দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী। পূর্বসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর তাঁর অত্যধিক ভক্তির মূল ব্রাশিত নয়, অন্ধ গোঁড়ামি কে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, তাই যেখানে ধর্মের নামে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানেই তিনি প্রকাশ করেন স্বমূর্তি, 'স্নানযাত্রা' কবিতাটিতে রয়েছে এইভাবেরই প্রকাশ, সে যুগের সামাজিক নৈতিক ব্যভিচারের একটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় মহেশের স্নান যাত্রায় —

"চরনে বিলাতি জুতো পারিলেন বোপবুতি
হারিলেন পৈতৃক ওসড়,
চাপাতলা শূন্য করি যানে যত নব হরি
ঘস ঘস ঘসড় ঘসড়,"

স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বর গুপ্তের আরেকটি আধুনিকতা লক্ষন বলে ধরা যেতে পারে। 'স্বদেশ' কবিতায় তিনি লিখেছেন —

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগনে
প্রেমপূর্ন নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" —

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ইতিহাস চেতনার পরিচয় ও রয়েছে। প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য রচনার মাধ্যমে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। সমকালীন যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েও কবিতা রচনার নির্দশন তাঁর আছে। এদিক থেকে তিনি প্রথম আধুনিকতা লক্ষনাক্রান্ত কবি, আসলে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা প্রাচীন ও নবীন যুগের পরিবর্তন গ্রহন করতে পারেন নি বলে প্রাচীন পন্থি প্রমান মেলে। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে সে ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। নতুন ভাব ধারায় সম্পূর্ন রূপে অবগাহন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে তার সম্বন্ধে বলা হয় —

"ঈশ্বর গুপ্ত আঙ্গিকে পুরানো কিন্তু ভাবে নতুন।" —

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক। চারিদিকে যা দেখেছেন কৌতুক সহকারে তা তাই ফুটিয়ে তুলেছেন। গভীর জীবনবোধের পরিচয় তাঁর কবিতায় নেই। জীবনকে হাল্কাভাবে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টি তাঁর ছিলো বলে নানা বিষয়ে তিনি ব্যঙ্গরসের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে কৌতুকপূর্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে তাঁর রচনায় সূক্ষ্মতা বা গভীরতা ছিলো না, তাই তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় —

"ঈশ্বরগুপ্ত সমসাময়িক ঘটনার কবি, লৌকিক আচার ও সামাজিক পরিচিতির কবি, গভীর জীবন বোধের কবি নয়।"

আর এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তাই বোধহয় তাঁর সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা, তিনি লিখেছেন —